বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ইতিহাস

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এর ধারণা নিয়ে ইতিহাসবিদ ও তাত্ত্বিকদের সুগভীর চিন্তাভাবনা ও গবেষণালব্ধ ফল আমাদেরকে জানতে সাহায্য করে- প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথা। তবে আশঙ্কা এই যে, প্রাচীনকালে সত্যই বাংলা ভাষা-সাহিত্য কিরূপ ছিল তা আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকরা নিরূপণ করতে পারেন নি। ফলে তত্ত্ব গবেষণার মাধ্যমে নানা মতের উদ্ভব হয়েছে। তর্কের দ্বারা বাতিল হয়েছে একাধিক, আবার গৃহীত হয়েছে অসংখ্য। ফলে এ বিষয়য়ে কারো মতভেদ থাকবে না যে, বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারার কোনো সুলিখিত প্রতিবেদন নেই। অনুমান নির্ভর ও গবেষণা লব্ধ তাত্ত্বিক ফলকেই আমরা ধরে নেই প্রমাণ বলে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা বলার পূর্বে যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল- বাংলা ভাষার জন্মকথা। অতএব প্রথমেই আমাদের বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হবে অতঃপর সাহিত্য।

সংজ্ঞা:

মানুষ মনের ভাব প্রকাশের জন্য যেসব অর্থবোধক ধ্বনি উচ্চারণ করে, তাকে ভাষা বলা হয়। মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য যেসব অর্থবোধক ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, তা-ই মানুষের ভাষা। কথা বলার জন্য যেসব ধ্বনি ব্যবহার করা হয় তার কোনো না কোনো অর্থ থাকতে হয়। ধ্বনির অর্থ না থাকলে তা কখনই ভাষা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 'মানবজাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমূহ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা।'

মানুষের মুখ থেকে ধ্বনি ভাষা হিসেবে বাগযন্ত্র দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই বাগযন্ত্র বা কথা বলার যন্ত্র বলতে মানুষের গলা, দাঁত, মাড়ি, জিব, ঠোঁট, নাক, তালু, মুখের গর্ত-এসব বোঝায়। গলা থেকে মুখ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে মুখের নানা জায়গায় আঘাত খেয়ে বিভিন্ন রকম ধ্বনির সৃষ্টি করে। এই ধ্বনির অর্থ থাকলে তা হয়ে ওঠে ভাষা।

মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কয়েকটি ধ্বনির অর্থবোধক মিলনে শব্দ গঠিত হয়। এই শব্দের মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। শব্দের অর্থ না থাকলে একজনের মুখের ধ্বনি অন্য লোকে বুঝতে পারে না। বুঝতে না পারলে সে ধ্বনি বা শব্দকে ভাষা বলা যাবে না। পশুর মুখের ধ্বনি মানুষ বোঝে না। সে জন্য পশু বা পাখির ডাক ভাষা নয়। কখনো কখনো ইঙ্গিত দিয়েও মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, কিন্তু তা ভাষা বলে বিবেচিত হতে পারে না। ভাষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। ভাষা মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম।

বাংলা ভাষা কী?:

বাঙালি সংস্কৃতির অধিকারী বাঙালি জাতি যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে বা কথা বলে তাই বাংলা ভাষা। ভাষাগত দিক দিয়ে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার অবস্থান ৪র্থ এবং বাংলা ভাষাভাষী জনংসংখ্যা মোট চব্বিশ কোটি। বাংলা ভাষাভাষীরা থাকে বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারে। তবে বর্তমানে প্রবাসী বাংলাদেশী ও প্রবাসী ভারতীয় বাংলাভাষী মানুষ এর কল্যাণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ থাকে।

ভাষার উৎস:

(ইংরেজি: ঙৎরমরহ ড়ভ ষধহমঁধমব), যার ভাষাবৈজ্ঞানিক ইংরেজি নাম গ্লটোগনি বা গ্লসোগনি (এষড়ঃঃড়মড়হু, এষড়ংংড়মবহু), নিয়ে বহু শতাব্দী ধরে লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু ভাষার পরিবর্তনশীলতার জন্য প্রাচীন ভাষাগুলির উৎসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য প্রায় নেই বললেই চলে। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে আকার-ইঙ্গিতের নির্বাক অথবা প্রাক-ভাষা থেকে অন্তত একবার মৌখিক ভাষার জন্ম হয়। কিন্তু এর বেশি জানা নেই। বর্তমান মানব সভ্যতার কোথাও এখন সেই আদিম প্রাক ভাষার অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞানীরা তাই বিভিন্ন অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি (রহফরৎবপঃ সবঃযড়ফ) প্রয়োগ করে ভাষার উৎস খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

ভাষার উৎপত্তি বা জন্ম:

৮০ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকার কিছু জঙ্গলে বাস করত এপ-জাতীয় কিছু প্রাণী। এই এপ-জাতীয় প্রাণীগুলির মধ্যে শিম্পাঞ্জি ও মানুষদের পূর্বপুরুষও ছিল। এরা সম্ভবত ছিল বর্তমান গরিলাদের মত। এরা মূলত বৃক্ষে বসবাস করত, মাটিতে চার পায়ে হাঁটত এবং বিশ-ত্রিশটার মত ভিন্ন ডাকের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করত। আজ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগে মানুষের পূর্বপুরুষ প্রাণীটি শিম্পাঞ্জিদের পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে এই প্রাণীগুলির ভাষা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশ উন্নত; কিন্তু মানুষদের এই আদি পূর্বপুরুষদের ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে খুব কমই জানতে পারা গেছে। আধুনিক মানুষ তথা ঐড়সড় ঝধঢ়রবহং-এর ভাষার উৎস নিয়ে বিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সময় ধরেই তেমন গবেষণা হয়নি। কেবল অতি সম্প্রতি এসেই এ বিষয়ে নৃবিজ্ঞানী, জিনবিজ্ঞানী, প্রাইমেটবিজ্ঞানী এবং স্নায়ুজীববিজ্ঞানীদের আহরিত তথ্য কিছু কিছু ভাষাবিজ্ঞানী খতিয়ে দেখছেন।

বিশ্বের অনেক ধর্মেই ভাষার উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইহুদী-খ্রিস্টান-ইসলাম ধর্মের ধারায় বলা হয়, ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমকে বিশ্বের যাবতীয় পশু-পাখীর উপর কর্তৃত্ব দেন, এবং আদম এই সব পশু-পাখির একটি করে নাম দেন; এটি ছিল আদমের ভাষাজ্ঞানের প্রথম বড় প্রয়োগ। বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষার প্রাচুর্যের কারণ হিসেবে বাবেলের মিনারের কাহিনীর উল্লেখ করা হয়; এই কাহিনী অনুসারে বর্তমান পৃথিবীতে ভাষার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য হল মানুষের ঔদ্ধত্যের শাস্তি। এই ধর্মীয় কাহিনীগুলি অতীতে মেনে নেয়া হলেও বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ভাষার উৎসের একটি প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৮শ শতকের বেশ কিছু ইউরোপীয় দার্শনিক যেমন জঁ-জাক রুসো, কোঁদিয়াক, হার্ডার, প্রমুখ মনে করতেন ভাষার উৎস নির্ণয় করা খুব কঠিন কোন কাজ নয়। ভাষা যে মানুষের লিখিত ইতিহাসের চেয়ে বহু প্রাচীন, এ ব্যাপারটিকে তারা তেমন আমল দেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন, ভাষাহীন মানুষ কীভাবে বসবাস করত, তা মনের পর্দায় গভীরভাবে কল্পনা করে যৌক্তিকভাবে এগোলেই ভাষার কীভাবে উৎপত্তি হল, সে বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এই অনুমানগুলির মধ্যে কোন ঐকমত্য নেই। ১৯শ শতকে ভাষার উৎস নিয়ে এমন সব উদ্ভট, কল্পনাপ্রসূত তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছিল, যে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে প্যারিসের ভাষাতাত্ত্বিক সমিতি একটি নির্ভরযোগ্য সংগঠন হিসেবে নিজেদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের সমিতিতে ভাষার উৎস সংক্রান্ত যেকোন গবেষণাপত্র পাঠে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। আজও বেশির ভাগ ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার উৎস সম্পর্কে তেমন আগ্রহী নন, কেননা তাদের মতে ভাষার উৎস নিয়ে যেকোন ধরনের সিদ্ধান্ত এতটাই কল্পনাপ্রসূত যে এগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বের সাথে নেয়া সম্ভব নয়।

১৯৬০-এর দশক থেকে নোম চম্স্কির প্রবর্তিত ধারণাগুলি ব্যাকরণের তত্ত্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। চম্স্কির মতে ভাষাবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় একটি প্রশ্ন হল মস্তিষ্কে অন্তর্নিহিত যে ক্ষমতাবলে মানুষ তার জীবনের প্রথম বছরগুলিতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দক্ষভাবে কোন

ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করে, সেই জৈবিক ক্ষমতার প্রকৃতি কী? এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষার উৎসের গবেষণা বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানের একটি অংশ বলেই মনে হয়। কীভাবে আদি মানুষের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ ঘটেছিল? অন্যান্য প্রাইমেটদের মধ্যে কীভাবে এর বিবর্তন ঘটে?

ভাষার উদ্ভব এবং প্রাচীনকালের বাংলা ভাষা:

মূলত বাংলা ভাষা কোনো সুনির্দিষ্ট কালে জন্মলাভ করে নি। বিভিন্ন ভাষার বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রূপলাভ করেছে বাংলায়। মূল আলোচনা ব্যতিরেকে বাংলা ভাষার জন্মকথা নিয়ে আলোচনা গৌণ হয়ে যায় বলে, সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাংলা ভাষার আদিরূপ ও ক্রমবিকাশ তুলে ধরছি-

বাংলা ভাষা বিবর্তনের রূপরেখা

খৃস্টপূর্ব ৩৫০০ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বাংলা ভাষার বির্বতন:
শতম (৩৫০০-২৫০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ)- য়ূস্ এশ্বোম্ স্পেশিএথে।
আর্য (২৫০০-১৫০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ)- য়ূস অশ্বম্ স্পশ্যাথ।
প্রাচীন ভারতীয় আর্য (১৫০০-১০০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ)- য়ূয়ম অশ্বম্ স্পশ্যাথ।
প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য বা আদিম প্রাকৃত (১০০০-৮০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ)- তুস্মে ঘোটকং দৃক্ষথ। [সংস্কৃত য়ূয়ংম (ঘোটকং) পশ্যথ]
প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত (৮০০ পূঃ খ্রীঃ অঃ ২০০ খ্রীঃ অঃ)- তুম্হে ঘোটকং দেকখথ।[পালি তুমহে ঘোটকং দেকখখ।]
গৌড়ি প্রাকৃত (২০০- ৪৫০ খ্রীঃ অঃ)- তুম্হে ঘোড়াঅং দেকখহ।
গৌড়ি অপভ্রংশ (৪৫০- ৬৫০ খ্রীঃ অঃ)- তুম্হে ঘোড়অ দেকখহ।
প্রাচীন যুগ (৬৫০- ১২০০ খ্রীঃ অঃ)- তুম্হে ঘোড়া দেখহ।
সন্ধিযুগ (১২০০-১৩৫০ খ্রীঃ অঃ)- তুম্হি ঘোড়া দেখহ।
মধ্য যুগ (১৩৫০- ১৮০০ খ্রীঃ অঃ)- তুম্হি/ তোম্হে ঘোড়া দেখহ।
আধুনিক যুগ (১৮০০- বর্তমান) তুমি ঘোড়া দেখ।
বর্তমান যুগ (১৮৬০- বর্তমান)- তুমি ঘোড়া দ্যাখো।

এ থেকে স্পষ্ট হয়, হিন্দ-ইয়ুরোপায়ণ (ইন্দো-ইউরোপীয়) হল বাংলার আদি ভাষা বংশ। কিন্তু প্রশ্ন হল- ভাষা, তথা ধ্বনির উৎপত্তি হল কিভাবে ? ভাষাবিদরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন ভাষা সৃষ্টির রহস্য, এবং উদ্ঘাটন করেছেন নানা তত্ত্ব-তথ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে মনে করা হত- প্রাকৃতিক ধ্বনি থেকে ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর যথার্থ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এবং এ থেকে যে তত্ত্বগুলো তৈরি করা হয়েছিল, তাও ছিল মনগড়া এবং যথার্থই হাস্যকর। যেমনঃ- কুকুরের আওয়াজ থেকে ধ্বনি তৈরি হয়েছে বলে তৈরি হয় 'ভৌ-ভৌ তত্ত্ব', মানুষের আবেগ অনুসৃত 'পুঃ পুঃ তত্ত্ব', বস্তু থেকে পাওয়া অওয়াজের জন্য 'ডিঙ-ডঙ তত্ত্ব' ইত্যাদি ! এসব তত্ত্ব থেকে ভাষা সৃষ্টির সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও, এগুলো ভাষা সৃষ্টির আদিরূপের সন্ধান দেয়। বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ঘড়ধস ঈযড়সংশু এ সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন- "ভাষা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। ভাষা মানুষের সৃজনী চেতনার সঙ্গে যুক্ত।" এছাড়া শরীরবিজ্ঞানের সাথে যোগসূত্র রেখে, চমস্কির অনুগামী এরিক লেনেবার্গ আরো গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেন-"প্রাণিজগতের বিবর্তনের মধ্যে এমন একটা মৌলিক জীবকোষগত রূপান্তর (জেনেটিক মিউটেশন) ঘটে যায়, যার ফলে মানুষ একদিন হোমো সাপিয়েন্স অর্থাৎ মননশীল

প্রাণী হয়ে ওঠে।" এথেকে বোঝা যায় যে, আমরা যে ভাষায় কথা বলি তা আমাদের মাধ্যমেই তৈরি হয় এবং নতুন-নতুন পরিস্থিতিতে বা প্রয়োজনে আমরা ভাষার ঐ মূলনীতিগুলো ব্যবহার কোরে মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাক্য গঠন করি। একজন মানুষ তার জীবনে যতগুলো বাক্য ব্যবহার করে, তা কোনো অতীতে তাকে মুখস্ত করিয়ে দেওয়া হয় না। বস্তুত মানুষ নিজের ইচ্ছামত ভাষাকে ব্যবহার করে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য আলোচনা পূর্বক ভাষার উৎপত্তি ও বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন এজন্য যে- ভাষাই সাহিত্যের সৃষ্টি ও স্থির নিদান।

সাহিত্যের সংজ্ঞা:

লিখন-শিল্পকে এককথায় সাহিত্য বলা যায়। মোটকথা ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য্য ও শিল্পের লিখিত প্রকাশ হচ্ছে সাহিত্য। গদ্য, পদ্য ও নাটক- এই তিন ধারায় প্রাথমিকভাবে সাহিত্যকে ভাগ করা যায়। গদ্যের মধ্যে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প ইত্যাদি এবং পদ্যের মধ্যে ছড়া, কবিতা ইত্যাদিকে শাখা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বাংলা ভাষায় লিখিত সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্য বলে।

বাংলা আদি সাহিত্য চর্যাপদ:

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'চর্যাগীতিকোষ।' এছাড়াও নাথগীতিকার উদ্ভব ঐ সময়েই হয়েছিল। কিন্তু 'নাথগীতিকা' নামক কোনো পুস্তক পাওয়া যায় নি। 'চর্যাগিতিকোষ' নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি আদিযুগের বাঙলা ভাষায় লেখা কয়েকজন কবির 'গীতবিতান।'
'চর্যাগীতিকোষ' বা 'চর্যাপদ' আবিষ্কারের পূর্বে সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা মনে করতেন, ময়না-মতীর গান, গোরক্ষবিজয়, শূণ্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচন, রূপকথা ইত্যাদি প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। কিন্তু ১৯০৭ সালে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। প্রাচীন যুগে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতাবলম্বী সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ বাংলা ভাষায় কিছু লিখেছেন কি-না, তা নিরূপণ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) নেপালে গমন করেন। লেপাল রাজদরবারে 'নেপাল রয়্যাল লাইব্রেরি' থেকে তিনি ১৯০৭ সালে প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির সাথে বাংলা ভাষায় লেখা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে'র পুঁথি আবিষ্কার করেন।

চর্যাপদের সময় কাল:

চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে ভাষাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন- ৬৫০ খ্রীঃ বাংলা সাহিত্যের আরম্ভকাল। এছাড়া ফরাসী পন্ডিত সিলভ্যাঁ লেভির (ঝুষাধরহ খবার) তাঁর খব ঘবঢ়ধষ (ঠড়ষ. ও.চ ৩৪৭) গ্রন্থে বলেছেন- "মৎসেন্দ্রনাথ (নাথপন্থার আদি গুরু) ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে নেপালে গমন করেন"। ফলে এটা ধারণা করা অস্বাভাবিক নয় যে, ৬৫০ খ্রীঃ এর দিকেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম। কিন্তু আরেকজন প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ঞযব ঙৎরমরহ ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ড়ভ ঃযব ইবহমধষর ষধহমঁধমব (ঠড়ষ ও.চ ১২২)-এ উল্লেখ করেন, "মীননাথের শিষ্য গোরাক্ষনাথের সময় খ্রীঃ ১২শ শতকের শেষে।" ফলে মীননাথ দ্বাদশ শতকের লোক। এজন্য তিনি প্রাচীনতম বাংলা রচনার কাল ৯৫০ খ্রীঃ অঃ বলে নির্দেশ করেন। এবং সুকুমার সেন সহ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব পন্ডিতই সুনীতিকুমারকে সমর্থন করেন।

চর্যাপদের ভাষা:

চর্যাপদের ভাষা মূলত বাংলা। খ্রীঃ দশম শতাব্দীর দিকে বা তার সামান্য পূর্বে, যখন মাগধী অপভ্রংশ সামান্য বিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় রূপলাভ করে, সেই অপরিণত ভাষায় সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাপদগুলি রচনা করেন। এ ভাষার মূল বুনিয়াদ মাগধী অপভ্রংশ থেকে জাত প্রাচীনতম বাংলা ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এর বেশিরভাগ শব্দই মাগধী অপভ্রংশজাত। এবং একে সাধারণভাবে বাংলা ভাষা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু

হিন্দি, ওড়িয়া, মৈথিল, অসমীয়া ভাষাও এর দাবীদার। ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বাঙালি বিদ্বানেরাও এ মত অসত্য বলে স্বীকার করেন নি। তবে চর্যাপদের ভাষা ছিল বড় জটিল রহস্যময়। কিছুটা বোঝা গেলেও বাকিটুকু থেকে যেত অসচ্ছ। চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এজন্য চর্যাপদের ভাষাকে 'সান্ধ্যভাষা' উল্লেখে মন্তব্য করেছেন- "সন্ধ্যাভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায় কতক বুঝা যায় না"। অবশ্য কবিদের এ ভাষা ব্যবহারের মূলে একটি কারণ ছিল। তা হল- চর্যাপদের কবিরা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। ফলে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিকূল ব্যক্তি বা গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় যাঁরা সহজিয়া বৌদ্ধদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তাঁদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবিগণ এই আলোআঁধার-মেঘরোদজড়ানো রূপক ভাষা ব্যবহার করেন।

চর্যাপদের কবি ও কবিতার সংখ্যা:

চর্যাপদ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লিখিত হয় নি। মূলত বৌদ্ধ সহজযানপন্থী সহজিয়াগণ তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য গান হিশেবে এই পদগুলি রচনা করেছিল। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, যোগ ও নাথধর্মের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় চর্যাপদ সৃষ্টির পিছনে। প্রতীক, রূপক ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে বৌদ্ধ সহজযান ধর্ম, সাধনপ্রণালী, দর্শনতত্ত্ব ও নির্বাণলাভ সম্পর্কে পদ রচনা করেছেন কবিগণ। এছাড়া বাংলা, মিথিলা, উড়িষ্যা, কামরূপের সাধারণ জনগণের প্রতিদিনের ধূলি-মলিন জীবনচিত্র, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ইত্যাদি বাঙালি আবেগ বিভিন্ন কল্পনাময় রেখাচিত্রের মাধ্যমে কবিতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চর্যাপদের কবিগণের নাম উল্লেখ পূর্বক চর্যায় কবিতা কয়টি ছিল তা নিয়ে মতভেদটি বর্ণনা করা যেতে পারে। চর্যাপদের মোট গানের সংখ্যা সুকুমার সেনের মতে ৫১ টি। বৌদ্ধতন্ত্রে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন বলে চর্যাপদের ব্যাখ্যা হিশেবে ওই সংস্কৃত টীকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক। সত্য বলতে, মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা এবং ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক আবিষ্কৃত চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের কারণেই আমরা চর্যার আক্ষরিক অর্থ ও গূঢ়ার্থ অনেকটা সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি। অন্যদিকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, চর্যায় গানের সংখ্যা ৫০ টি। আসলে চর্যাপদ ছিন্নাবস্থায় পাওয়া যায় বলে এই মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছে।

চর্যাপদে কবি সংখ্যা নিয়েও মতভেদ আছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'ইঁফফযরংঃ গুংঃরপ ঝড়হমং' গ্রন্থে ২৩ জন কবির কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড)' গ্রন্থে ২৪ জন কবির কথা উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন নেপাল-তিব্বতে প্রাপ্ত তালপাতার পুঁথিতে আরো করেকজন নতুন কবির চর্যাগীতি পেয়ে 'দোহা-কোশ (১৯৫৭)' গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। ফলে এককথায় বলা যায়, চর্যাপদের মোট কবির সংখ্যা ২৩, মতান্তরে ২৪ জন।

বাংলা সাহিত্য উৎপত্তি, বিকাশ ও ইতিহাস:

বাংলা সাহিত্য কালবিচারে বাংলা সাহিত্যকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়: প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০), মধ্যযুগ (১২০০-১৮০০) ও আধুনিক যুগ (১৮০০-)। মধ্যযুগ আবার তিনভাগে বিভক্ত: আদি-মধ্যযুগ (১২০০-১৩৫০), মধ্য-মধ্যযুগ (১৩৫০-১৭০০) ও অন্ত্য-মধ্যযুগ (১৭০০-১৮০০)। অনুরূপভাবে আধুনিক যুগও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত: প্রস্তুতিপর্ব (১৮০০-১৮৬০), বিকাশের যুগ (১৮৬০-১৯০০), রবীন্দ্রপর্ব (১৯০০-১৯৩০), রবীন্দ্রোত্তর পর্ব (১৯৩০-১৯৪৭) এবং পাক-ভারত যুগ (১৯৪৭-১৯৭১), বাংলাদেশ পর্ব (১৯৭১- বর্তমান পর্যন্ত)।

প্রাচীন যুগ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বঙ্গদেশ মৌর্যাধিকারে আসার পর থেকে আর্যভাষা এদেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং এর প্রায় সহস্রাব্দ পরে প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) কর্তৃক ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের পদগুলির রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। এতে বৌদ্ধ

সহজিয়াদের ধর্মতত্ত্ব ও সাধন-ভজনমূলক ৪৭টি পদ আছে এবং সেগুলি সুনির্ধারিত তাল, রাগ ও সুরে গীত হওয়ার উপযোগী। পদগুলির ভাব ও ভাষা সর্বত্র সহজবোধ্য নয়; কতক বোঝা যায় কতক বোঝা যায় না, তাই এ ভাষার নাম হয়েছে সন্ধ্যা ভাষা। ব্যঞ্জনাময় শব্দ-ব্যবহার, উপমা-রূপকাদি অলঙ্কারের প্রয়ো, প্রাকৃতিক বর্ণনা, সমাজচিত্র ইত্যাদি বিবেচনায় পদগুলির সাহিত্যিক ও ভাষানিদর্শনগত মূল্য অপরিসীম। পদগুলির পদকর্তাগণ 'সিদ্ধাচার্য' নামে খ্যাত এবং তাঁদের কয়েকজন হলেন লুইপা, ভুসুকুপা, কাহ্নপা, শবরপা প্রমুখ।

চর্যাপদের পরে প্রবাদ, বচন, ছড়া, ডাক ও খনার বচন ইত্যাদি কিছু কিছু কাব্যনিদর্শন থাকলেও চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো রচনা পাওয়া যায় না। তাই এ সময়টাকে (১২০১-১৩৫০) কেউ কেউ 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল পরিবর্তনের যুগ; ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতির সংস্পর্শে এবং মুসলিম শাসকদের ভিন্নতর রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে তখন এক নতুন পরিবেশ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছিল। সে সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ছিল সৃজ্যমান অবস্থায় এবং চর্যার বঙ্গীয়-বৈশিষ্ট্যময় অপভ্রংশ ভাষা আরও বেশি মাত্রায় বাংলা হয়ে ওঠে। এ যুগের প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৩শ-১৪শ শতকের রামাই পন্ডিতের গাথাজাতীয় রচনা শূন্যপুরাণ। এতে বৌদ্ধদের ওপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনাসম্বলিত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শীর্ষক একটি কবিতা আছে। এছাড়া আছে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত প্রাকৃতপৈঙ্গল নামক একটি গীতিকবিতার সংকলন, যার ছন্দ ও ভাষা প্রাকৃত বা আদি পর্যায়ের বাংলা। হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেখশুভোদয়া (আনু. ১২০৩) নামক সংস্কৃত গ্রন্থেও একটি বাংলা গান পাওয়া গেছে। এরূপ পীরমাহাত্ম্যসূচক ছড়া বা আর্যা, প্রেমসঙ্গীত এবং খনার বচন শ্রেণির দু-একটি বাংলা শ্লোকই এ সময়কার প্রধান রচনা।

মধ্যযুগ আদি-মধ্যযুগ:

মধ্যযুগ আদি-মধ্যযুগ সাধারণভাবে খ্রিস্টীয় ১৩শ-১৪শ শতক পর্যন্ত কাল বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগ বা চৈতন্যপূর্ব যুগ বলে চিহ্নিত। এ সময়ের বাংলা সাহিত্য তিনটি প্রধান ধারায় বিকশিত হয়েছে: বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গল সাহিত্য এবং অনুবাদ সাহিত্য। বড়— চন্ডীদাস (১৪শ শতক) এ সময়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি, যিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিষয়ক নাটগীতিকাব্য রচনা করেন। তাঁর আগে কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমমূলক যে গীতিসাহিত্যের প্রবর্তন করেন, চন্ডীদাস সেই ধারাকেই বিকশিত করে তোলেন।

সম্ভবত ইনিই আদি চন্ডীদাস, যাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ বলে ধরা যায়। মালাধর বসু সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে পয়ার ছন্দে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক উপাখ্যান শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। এই কাব্যের জন্য গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। এটি 'মঙ্গল' বা 'বিজয়' জাতীয় পাঁচালি বা আখ্যানকাব্য হিসেবে পরিচিত; তাই এর অন্য নাম গোবিন্দমঙ্গল বা গোবিন্দবিজয়। এই পাঁচালিকাব্য বাংলার অনুবাদ শাখারও একটি প্রাচীনতম নিদর্শন বলে অনেকে মনে করেন।

এ যুগেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদকাব্যের রচনা শুরু হয়। এ ব্যাপারে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময় বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ, তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২) এবং সেনাপতি পরাগল খাঁর উৎসাহ ও অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ব্রজবুলি ভাষায় বাঙালিদের পদ-রচনার শুরুও এ সময়েই। এ সময় কবি কঙ্ক সত্যপীরের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় সর্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর কাহিনী রচনা করেন (আনু. ১৫০২)। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাবও এ সময়। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত বাংলা ভাষায় প্রচার করলে বাংলা সাহিত্যের নতুন দিক উন্মোচিত হয় এবং বৈষ্ণব সাহিত্যেরও ভিত্তি স্থাপিত হয়।

মধ্য-মধ্যযুগ:

এ সময় চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে এক নবভক্তি-ধারার প্রবর্তন করেন, যা ভাবচৈতন্যের ক্ষেত্রে রেনেসাঁর সূচনা করে। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কারণে বাংলায় একটি শক্তিশালী সাহিত্যিকগোষ্ঠী এবং এক বিরাট সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়। এ যুগেই বাংলায় জীবনচরিত লেখার প্রচলন হয় এবং প্রধানত চৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনীগ্রন্থগুলি রচিত হয়। এ ধরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত (১৫৭৩), জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (১৬শ শতকের শেষভাগ), লোচনদাসের (১৫২৩-১৫৮৯) চৈতন্যমঙ্গল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত (১৬১৫)। এগুলি ছাড়া আরও কিছু উল্লেখ করার মতো চৈতন্য-সংশ্লিষ্ট জীবনীকাব্য হচ্ছে নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরতœাকর (চৈতন্যদেবের পার্ষদ-ভক্তদের জীবনী), নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস (শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের জীবনী এবং তাঁদের ধর্মমত প্রচারের কথা) ও ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ (১৫৬৮-৬৯)। এগুলির মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতকে চৈতন্যদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ মনে করা হয়। পান্ডিত্যপূর্ণ এ গ্রন্থে একাধারে জীবনচরিত, দার্শনিক তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল বেশকিছু ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যে পদাবলি:

এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যধারা হচ্ছে পদাবলি। এর শুরু চৈতন্যপূর্বযুগেই। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক এ সাহিত্য ভাব, ভাষা ও ছন্দে অতুলনীয়। এতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মার আত্মীয়রূপে কল্পিত; তাঁর ও ভক্তের মধ্যে কোনো দূরত্ব নেই। পরে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা এবং চৈতন্যদেবের প্রেমসাধনাকে অবলম্বন করেই বিস্তার লাভ করে মধ্যযুগের পদাবলি বা গীতিকাব্যের ধারা। চৈতন্যদেবের পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা পদাবলি সাহিত্য বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়। অনেকের মতে বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত জাগরণ ঘটে এই পদাবলি রচনার মধ্য দিয়েই। কতিপয় মুসলমানসহ অগণিত কবি রাধাকৃষ্ণলীলার পদ রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন, যেমন: চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, গোবিন্দদাস, কবিবল্লভ রায়শেখর, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, নরহরি দাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রমুখ। মিথিলার বিদ্যাপতি ছিলেন চৈতন্যপূর্ব কবি। মৈথিল ভাষায় রচিত তাঁর পদগুলি পদাবলি সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পদাবলি সাহিত্যের দুই সেরা কবি।

অনুবাদ সাহিত্য:

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝা। বড়— চন্ডীদাসের পরে তিনিই বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর রচিত রামায়ণ বাংলা ভাষায় প্রথম ও সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্য। বর্ণনার হৃদয়গ্রাহিতা এবং ভাষার প্রাঞ্জলতাই এর জনপ্রিয়তার কারণ। কৃত্তিবাস ১৫শ শতকের গোড়ার দিকে জীবিত ছিলেন। তাঁর কাব্যে মধ্যযুগের বাঙালি-জীবন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ১৮০২-৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে মুদ্রিত হয়। মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গে তা সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। উত্তরবঙ্গের অদ্ভুত আচার্য রামায়ণ গায়ক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। নোয়াখালীর দ্বিজ ভবানী দাসের শ্রীরামপাঁচালি কাব্য অধ্যাত্মরামায়ণ অবলম্বনে রচিত।

মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদ হচ্ছে কবীন্দ্র মহাভারত। ১৫১৫-১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর এটি রচনা করেন। লস্কর পরাগল খাঁর নির্দেশে রচিত বলে এটি পরাগলী মহাভারত নামেও পরিচিত। কবীন্দ্র মহাভারতে অশ্বমেধপর্ব সংক্ষিপ্ত ছিল বলে ছুটি খাঁর নির্দেশে শ্রীকর নন্দী জৈমিনিসংহিতার অশ্বমেধপর্ব অবলম্বনে বিস্তৃত আকারে সেটি রচনা করেন, যাকে পৃথক গ্রন্থ না বলে বরং কবীন্দ্র মহাভারতের পরিশিষ্ট বলা চলে। বাংলা মহাভারতের প্রধান কবি কাশীরাম দাস আনুমানিক ১৬০২-১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর কাব্য রচনা করেন। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে ১৮০১-৩ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি মুদ্রিত হয়। সকল বাংলা মহাভারতের মধ্যে এটি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মঙ্গলকাব্য:

বাংলার নিজস্ব উপাদানে রচিত লৌকিক দেবমাহাত্ম্যমূলক কাহিনীকাব্য। পাঁচালি কিংবা পালার আকারে চৈতন্যপূর্ব যুগেই এগুলি রচিত হয়। এগুলির নাম কেন মঙ্গলকাব্য হয়েছে সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। এর পালা এক মঙ্গলবারে শুরু হয়ে আরেক মঙ্গলবারে শেষ হতো বলে কেউ কেউ একে মঙ্গলকাব্য বলেছেন। নামকরণের ক্ষেত্রে এরূপ একটি কারণকে বিবেচনা করা হলেও মূলত কাব্যগাথার মাধ্যমে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার এবং তা শ্রবণে ধর্মীয় বিনোদনের সঙ্গে মঙ্গল কামনাই বাঙালি হিন্দু কবিকে মঙ্গলকাব্য রচনায় উৎসাহিত করে। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় পূর্ণ বঙ্গদেশে তাই অবশ্যম্ভাবিরূপে এসেছে পুরাণের দেবদেবীরা এবং ভক্তমনের কল্পনাপ্রবাহে অসংখ্য মানব ও অতিমানব; আর চরিত্রগুলিও হয়ে উঠেছে শাশ্বত বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া সংগ্রামী মানুষের প্রতীক। এই কাব্যগুলি থেকে বাংলাদেশের তৎকালীন ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন মনসামঙ্গল, তন্মধ্যে বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ (১৪৯৪) সর্বাধিক জনপ্রিয়। মনসামঙ্গল এক সময় পূর্ববঙ্গের জাতীয় কাব্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারা উৎকর্ষের জন্য বিখ্যাত। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (১৬শ শতক) রচিত চন্ডীমঙ্গল সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত; এর জন্য রাজা রঘুনাথ রায় তাঁকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হচ্ছে ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল ইত্যাদি এবং এগুলির প্রধান রচয়িতারা ছিলেন ১৮শ শতকের। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট; তাঁর পরবর্তী প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন খেলারাম চক্রবর্তী, যাঁর কাব্যের নাম গৌড়কাব্য; কিন্তু এঁদের কাব্যের পুথি পাওয়া যায়নি; একমাত্র রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যই পাওয়া গেছে, যার রচনাকাল ১৬৪৯-৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বলে ধরা হয়। রূপরাম বাস্তব দৃষ্টিতে মানব-জীবন বর্ণনা করেছেন। কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনে বৈদিক দেবতা রুদ্র শিবের রূপ ধারণ করে; শিব বাঙালি হিন্দুর জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই বাঙালির সুখ-দুঃখ ভরা সংসারের কথা স্থান পেয়েছে শিবমঙ্গলে। এ ধারার প্রথম কাব্য দ্বিজ রতিদেবের মৃগলুব্ধ (১৬৭৪) পাওয়া গেছে চট্টগ্রামের পটিয়ায়। শিবায়নের শ্রেষ্ঠ কাহিনীর রচয়িতা রামেশ্বর চক্রবর্তী (১৭১০-১১)। এগুলি ছাড়া শীতলামঙ্গল (কৃষ্ণরাম দাস) ও ষষ্ঠীমঙ্গল নামে দুটি মঙ্গলকাব্যের কথাও জানা যায়। ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের কথা নিয়ে রচিত শেষোক্ত কাব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কাব্যে সমাজধর্মের সমন্বয় প্রয়াসে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের কথা আছে। ফলে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে মুসলমান পীর বড় খাঁ গাজীর পূজাও এতে স্থান পেয়েছে।

সুলতানী আমল বাংলা সাহিত্য:

মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যচর্চা মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের বড় অবদান কাহিনীকাব্য বা রোম্যান্টিক কাব্যধারার প্রবর্তন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৌদ্ধ-হিন্দু রচিত বাংলা সাহিত্যে যেখানে দেবদেবীরা প্রধান এবং মানুষ অপ্রধান সেখানে মুসলমান রচিত সাহিত্যে মানুষ প্রাধান্য পেয়েছে। মুসলমান কবিরা কাহিনীকাব্য ও ধর্মীয় সাহিত্যের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়মূলক সাহিত্যও রচনা করেছেন; এমনকি চৌতিশা, জ্যোতিষ ও সঙ্গীতশাস্ত্রীয় কাব্যও তাঁরা রচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে মধ্যযুগের মুসলমান রচিত কাব্যগুলিকে প্রধানত ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়: কাহিনীকাব্য, ধর্মীয় কাব্য, সংস্কৃতিবিষয়ক কাব্য, শোকগাথা, জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কাব্য এবং সঙ্গীতশাস্ত্রীয় কাব্য।

মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তাঁর কাব্য 'ইউসুফ-জুলেখা' সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪১০) রচিত বলে মনে করা হয়। এর সব পুথি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা ও পার্শবর্তী ভারতীয় ত্রিপুরা) থেকে পাওয়া গেছে। বাইবেল-কুরআনের ইউসুফ নবীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী যা ফেরদৌস ও জামীর ইউসুফ-জুলেখায় পল্লবিত, তিনি তা বাংলায় যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তাতে তা একটি মৌলিক কাব্যের মর্যাদা পেয়েছে। জৈনুদ্দীন একটিমাত্র কাব্য রসুলবিজয় রচনা করে খ্যাতি লাভ

করেন। তিনি গৌড় সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-৮১) সভাকবি ছিলেন। এর গল্পাংশ ফারসি থেকে নেওয়া। 'বিজয়' জাতীয় যে কাব্যধারা মধ্যযুগে প্রাধান্য লাভ করে তদনুসারেই এর নামের সঙ্গে 'বিজয়' শব্দটি যুক্ত হয়। কাহিনীতে কিছু ঐতিহাসিক নামের উল্লেখ থাকলেও ঘটনা ঐতিহাসিক নয়। মুজাম্মিল ১৫শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বর্তমান ছিলেন। তিনি প্রধানত তিনটি কাব্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন: নীতিশাস্ত্রবার্তা, সায়াৎনামা ও খঞ্জনচরিত। আরবির অনুবাদ সায়াৎনামায় সুফিবাদ স্থান পেয়েছে এবং অনুবাদে স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে কাব্যটি আকর্ষণীয় হয়েছে। তাঁর নীতিশাস্ত্রবার্তায় বহু বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। চাঁদ কাজী ছিলেন গৌড় সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) নবদ্বীপের কাজী। তিনি এ পদে থাকাকালেই নবদ্বীপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের প্রচার ও প্রসার ঘটে এবং তিনি নানা কারণে বৈষ্ণব-ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি কোনো কাব্য রচনা করেননি, তবে বৈষ্ণব পদ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। শেখ কবীরও ছিলেন একজন খ্যাতিমান পদকর্তা। তিনি সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের সময়ে আবির্ভূত হন এবং সম্ভবত তাঁর রাজকর্মচারী ছিলেন। আফজাল আলী এযুগের কবিদের অন্যতম। নসিহৎনামা নামে একটি কাব্য এবং বৈষ্ণবীয় ঢঙে রচিত তাঁর কয়েকটি পদ পাওয়া গেছে (সম্ভবত ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের দিকে রচিত)। এ গ্রন্থে কবিত্ব তেমন নেই, তবে সরল ভাষায় ধর্মোপদেশ আছে। সাবিরিদ খান বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা বলে মনে করা হলেও কোনোটিরই সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসুন্দর, রসুলবিজয় এবং হানিফা ও কয়রাপরী নামে তাঁর তিনটি কাব্যের খন্ডিত পুথি পাওয়া গেছে। দোনাগাজীর বিখ্যাত কাব্য সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল। তিনি সম্ভবত ১৬শ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। তাঁর ভাষা সাধারণ এবং প্রাকৃত-প্রভাব ও সারল্যের মিশ্রণে প্রাচীনত্বের দ্যোতক। শেখ ফয়জুল্লাহ মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। যে পাঁচটি গ্রন্থের জন্য তিনি খ্যাতিমান সেগুলি: গোরক্ষবিজয়, গাজীবিজয়, সত্যপীর (১৫৭৫), জয়নবের চৌতিশা এবং রাগনামা। রাগনামাকে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সঙ্গীতবিষয়ক কাব্য মনে করা হয়। দৌলত উজীর বাহরাম খাঁর একটিমাত্র কাব্য পাওয়া গেছে এবং সেটি হলো লায়লী-মজনু; এর রচনাকাল ১৫৬০-৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনুমান করা হয়। এটি ফারসি কবি জামীর লাইলী-মজনু কাব্যের ভাবানুবাদ; তবে স্বচ্ছন্দ রচনা, কাব্যরস ইত্যাদি গুণে এটি অনন্য। মুহম্মদ কবীর একটিমাত্র কাব্য মধুমালতী রচনা করেই বিখ্যাত হন। ১৫৮৩-৮৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাব্যটি রচিত বলে মনে করা হয়। কাব্যের পরিবেশ ও পরিকল্পনা গুলে বকাওলী জাতীয়।

অন্যান্য মুসলমান কবি:

এছাড়া অন্যান্য মুসলমান কবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: সৈয়দ সুলতান (আনু. ১৫৫০-১৬৪৮, কাব্য: নবীবংশ, শব-ই-মিরাজ, রসুলবিজয়, ওফাৎ-ই-রসুল, জয়কুম রাজার লড়াই, ইবলিসনামা, জ্ঞানচৌতিশা, জ্ঞানপ্রদীপ, মারফতি গান, পদাবলি), শেখ পরান (আনু. ১৫৫০-১৬১৫, কাব্য: নূরনামা, নসিহৎনামা), হাজী মুহাম্মদ (আনু. ১৫৫০-১৬২০, কাব্য: নূর জামাল, সুরৎনামা), মীর মুহাম্মদ শফী (আনু. ১৫৫৯-১৬৩০, কাব্য: নূরনামা, নূরকন্দীল, সায়াৎনামা), নসরুল্লাহ্ খাঁ (আনু. ১৫৬০-১৬২৫, কাব্য: জঙ্গনামা, মুসার সওয়াল, শরীয়ৎনামা, হিদায়িতুল ইসলাম), মুহম্মদ খান (আনু. ১৫৮০-১৬৫০, কাব্য: সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ, হানিফার লড়াই, মকতুল হুসেন), সৈয়দ মর্তুজা (আনু. ১৫৯০-১৬৬২, কাব্য: যোগ-কলন্দর, পদাবলি), শেখ মুত্তালিব (আনু. ১৫৯৫-১৬৬০, কাব্য: কিফায়িতুল-মুসল্লীন), আবদুল হাকীম (আনু. ১৬২০-১৬৯০, কাব্য: লালমতী-সয়ফুল্মুল্ক, নূরনামাসহ ৮টি)। ১৬০০ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকজন হলেন নওয়াজিশ খাঁ, কমর আলী, মঙ্গল (চাঁদ), আবদুন নবী, মুহম্মদ ফসীহ, ফকির গরীবুল্লাহ্, মুহম্মদ ইয়াকুব, শেখ মনসুর, শেখ চাঁদ, মুহম্মদ উজীর আলী, শেখ সাদী, হেয়াত মামুদ প্রমুখ। সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ, মুহম্মদ খানের মকতুল হোসেন এবং শেখ চাঁদের রসুলবিজয়কে ইসলামি পুরাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

আরাকানে বাংলা সাহিত্য:

মধ্যযুগের অন্তিম পর্বে বঙ্গদেশের সীমান্তবর্তী স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন রাজাদের রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চর্চা হয়। উত্তরবঙ্গের

কামতা-কামরূপের (অর্থাৎ কোচ রাজবংশের) রাজসভা, পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা ও আরাকানের (রোসাঙ্গ) রাজসভা এবং পশ্চিমবঙ্গে মল্লভূম-ধলভূমের রাজসভায় বাংলা ভাষায় বিবিধ কাব্যধারার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে আরাকানি ধারা বিশিষ্ট। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের করদ রাজ্যে পরিণত হওয়ার পর থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আরাকানি রাজগণ বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উল্লেখযোগ্যভাবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এর পশ্চাতে সেখানকার বাংলাভাষী সভাসদ ও বিদ্বজ্জনদেরও অবদান ছিল। আরাকান রাজসভাতেই বাংলা ভাষার প্রথম মানবীয় প্রণয়কাব্য রচিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই আরাকান রাজসভার নাম সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

আরাকান রাজসভার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় যাঁরা কাব্যচর্চা করেন তাঁদের মধ্যে দৌলত কাজী (আনু. ১৬০০-১৬৩৮) প্রাচীনতম। তাঁর সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী প্রথম মানবীয় প্রণয়কাব্য। তিনি এ কাব্যের রচনা শুরু করেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি; শেষ করেন আলাওল (আনু. ১৬০৭-১৬৮০)। এর মূল কাহিনী আওধী (গোহারি) ভাষায় উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল। কাব্যটি তিন খন্ডে বিভক্ত। এতে কবির অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও সৌন্দর্যবোধ ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণব পদাবলির ঢঙে তিনি নববর্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা বাংলা 'বারমাস্যার' একঘেয়েমির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব ব্যতিক্রম।

বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে আলাওল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর মতো বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও পন্ডিত কবি মধ্যযুগে বিরল। তিনি আরাকানের প্রধানমন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুরের (আনু. ১৬০০-১৬৬০) আশ্রয়ে থেকে কাব্যচর্চা শুরু করেন। পরবর্তী জীবনেও তিনি বহু সভাসদের অনুগ্রহে কাব্যসাধনা করেন। এ যাবৎ তাঁর যে পাঁচটি কাব্য পাওয়া গেছে তন্মধ্যে পদ্মাবতী শ্রেষ্ঠ। এটি হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবত (১৬৫১) অবলম্বনে রচিত হলেও মৌলিকতার কারণে পাঠকনন্দিত। তাঁর অপর চারটি কাব্যও অনুবাদমূলক এবং সেগুলি হলো হপ্তপয়কর, তোহফা, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল ও সিকান্দরনামা। এগুলি ছাড়া আলাওল কিছু পদাবলি ও গানও রচনা করেন। তাঁর কাব্যে মানবপ্রেম ও অধ্যাত্ম প্রেম দুয়েরই মিলন ঘটেছে।

আরাকানের অন্যান্য কবি হচ্ছেন মরদন (আনু. ১৬০০-১৬৪৫), মাগন ঠাকুর প্রমুখ। মরদনের কাব্যের নাম নসীরনামা এবং মাগন ঠাকুরের কাব্যের নাম চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী একটি কাহিনীকাব্য এবং রূপকথা শ্রেণির অন্তর্গত। আবদুল করীম খোন্দকার ছিলেন আলাওল পরবর্তী শক্তিশালী কবি। দুল্লা মজলিস (ফারসি গ্রন্থের ভাবানুবাদ) নামে তাঁর একটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে, যার রচনাকাল ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দ বলে ধরা হয়। এর আগে তিনি হাজার মসায়েল ও তমিম আনসারী নামে আরও দুটি কাব্য রচনা করেন বলে মনে করা হয়। তাঁর কাব্যগুলি ইসলাম ধর্মীয়।

অন্ত্য-মধ্যযুগ:

এ সময়টা নানা দিক থেকে বাংলার অবক্ষয় যুগ এবং রাজনৈতিক দিক থেকে নবাবি আমল হিসেবে চিহ্নিত। এ সময় মুগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়, বাংলার নবাবদের উত্থান-পতন, ইউরোপীয় বেনিয়া শক্তির আগ্রাসন এবং কোম্পানি আমলের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে সাহিত্য সৃষ্টির স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাবি আমলেরই জের চলতে থাকে। এ যুগেও তাই হিন্দু পৌরাণিক ও ইসলামি ভাবসমৃদ্ধ পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ ইত্যাদি সাহিত্যের ধারা অব্যাহত থাকে।

পদাবলি:

আঠারো শতকে যাঁরা পদ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: নরহরি চক্রবর্তী, নটবর দাস, দীনবন্ধু দাস, চন্দ্রশেখর-শশিশেখর ও জগদানন্দ। এঁদের পদে অর্থ ও ভাবের বদলে চটুল ছন্দোবৈচিত্র্য বা ঝঙ্কারের প্রাধান্যই বেশি। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি এ সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য পদাবলি গ্রন্থ।

রামায়ণমূলক রচনা:

এ সময় 'রায়বার' নামে এক বিশিষ্ট ধারার সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা রাজদ্বার বা রাজস্তুতিকে বোঝাতো। এগুলি প্রকৃতপক্ষে রাজসভার স্থূল ও মুখরোচক কথোপকথন, যাকে পরবর্তীকালের খেউড়-তরজার পূর্বরূপ বলা চলে। আরেকটি ধারা হলো তরণীসেনের যুদ্ধ উপাখ্যান, যার সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালি হিন্দুদের ভক্তিধর্মের প্রাবল্যের কারণে। এ দুটি কাহিনী তখনকার বাঙালি-উদ্ভাবনা হিসেবে স্মরণীয়। এরূপ উপাখ্যানের প্রধান রচয়িতা দ্বিজ দয়ারাম। রামানন্দ ঘোষের রামায়ণকাব্য (১৭৮০?) এবং জগৎরাম রায়ের অদ্ভুত রামায়ণও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঁচালি কাব্য:

বিদ্যাসুন্দরের পাঁচালি বিদ্যাসুন্দর কাব্য অনেকটা রূপক বা আধ্যাত্মিক ভাবধারায় রচিত। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উৎস কাশ্মীরী পন্ডিত বিহ্লনের (১২শ শতক) চৌরপঞ্চাশৎ বলে অনুমান করা হয়। এতে দেহভোগের প্রাবাল্য দেখা যায়। বাংলায় ষোলো শতকে দ্বিজ শ্রীধর ও কবি কঙ্ক এবং সতেরো শতকে গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম দাস, প্রাণরাম চক্রবর্তী ও সাবিরিদ খান এ কাহিনী রচনা করেন। কাহিনীটি পরে 'পালা' হিসেবে কালিকামঙ্গলে যুক্ত হয়।

মঙ্গলকাব্য:

এ সময়ে ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন বা শিবমঙ্গল বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। রামচন্দ্র যতির চন্ডীমঙ্গলও (১৭৬৬-৬৭) এ সময়ের উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য। ধর্মমঙ্গলের কবিরা হলেন ঘনরাম চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, রামকান্ত রায়, সহদেব চক্রবর্তী প্রমুখ। ঘনরাম চক্রবর্তী 'কবিরতœ' উপাধিতে ভূষিত হন এবং সাহিত্যে তাঁর স্থান ছিল ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পরেই। তাঁর ধর্মমঙ্গলে (১৭১১) উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন নরসিংহ বসু। মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে (১৭৮১) ঘনরামের প্রভাব আছে। রামকান্ত রায়ের ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত আত্মকাহিনীতে নতুনত্ব এসেছে বেকারত্বের সঙ্গে কাব্য-উপলক্ষের নাটকীয় বর্ণনায়। তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ। এ সময় নতুন দেবদেবীদের নিয়েও কিছু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়, যেমন: সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে দুর্গাদাস মুখার্জীর গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী উল্লেখযোগ্য।

আঠারো শতকে মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। তাঁর মাধ্যমে একটা যুগের পরিণতি ঘটেছে। তাঁর প্রধান রচনা অন্নদামঙ্গল আটটি পালায় তিন খন্ডে বিভক্ত: শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল ও মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল। খন্ডগুলির মধ্যে অন্নদা একটি ক্ষীণ যোগসূত্র রক্ষা করেন, যদিও তাঁর কৃপায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের ভাগ্যোদয়ের ঘটনাই এ কাব্যের মূল বিষয়। বিদ্যাসুন্দরের রসালো কাহিনীটি আঠারো শতকের ধারা ও রুচির পরিচায়ক। তাঁর আরও কয়েকটি গ্রন্থ হলো সত্যনারায়ণের পাঁচালি, রসমঞ্জরী এবং সংস্কৃতে রচিত নাগাষ্টক ও গঙ্গাষ্টক। অন্নদামঙ্গল পরবর্তীকালের কবিদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। কালিকামঙ্গলের কবিরা একে ব্যাপকভাবে অনুকরণ করেন। তাছাড়া প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হ্যালহেড (১৭৭৮) ও লেবেদেফ (১৮০১) এবং বাংলা অভিধান রচনায় (১৭৯৯-১৮০২) ফরস্টার অন্নদামঙ্গলের ভাষারই উদাহরণ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অন্ত্যমধ্যযুগে উঁচুমানের সাহিত্য ভারতচন্দ্রের হাতেই সৃষ্টি হয়েছে। ছন্দের চমৎকার প্রয়োগ, বিশাল শব্দসম্ভার, পদরচনায় লালিত্যগুণের সঞ্চার ইত্যাদি কারণে তাঁর কাব্য অনুপম হয়ে উঠেছে।

রামপ্রসাদ সেন ক্ষয়িষ্ণু যুগের কৃত্রিমতার মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন তাঁর আন্তরিক ভক্তি ও সরল বাচনভঙ্গির জন্য। শাক্তপদাবলির কবি হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হলেও তিনি বিদ্যাসুন্দর কাহিনী এবং কৃষ্ণকীর্তনও রচনা করেন। যে গানের জন্য রামপ্রসাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব তাতে রয়েছে ঘরোয়া ভাবের ছোঁয়া এবং আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা। তাঁরই গানে ভয়ঙ্করী কালীদেবী হয়ে ওঠেন দয়াময়ী জননী।

লোকগাথা:

আঠারো শতকের অন্যতম সাহিত্যধারা। এর প্রধান বিষয় প্রণয়কাহিনী। অধিকাংশ লোকগাথাই ছিল অলিখিত, লোকমুখে প্রচলিত; ফলে সেগুলির ভাব, ভাষা ও উপমায় প্রক্ষেপণ ঘটেছে ঊনিশ শতক পর্যন্ত গাথাগুলির প্রায় সবটিতেই নারীর ভূমিকা প্রধান। এ ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। গীতিকাগুলির কালনির্ণয় দুরূহ। প্রথমটি দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) ও দ্বিতীয়টি চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহকরে প্রকাশ করেন। এগুলিতে পল্লীর লোকজীবন চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

অবক্ষয়িত সমাজ-মানসের বিস্রস্ত রুচির প্রকাশ ঘটে পাঁচালি, যাত্রা, তরজা, কবিগান ইত্যাদিতে। বাংলায় পাঁচালি গানের প্রচলন ছিল বহু আগে থেকেই। যাত্রার উদ্ভব হয় দেবদেবীদের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে এবং কৃষ্ণলীলা ছিল এর মূল বিষয়; পরে অবশ্য বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। তরজার প্রচলন হয় চৈতন্যদেবের সময় থেকে এবং অবক্ষয়কালে তা হয়ে যায় উত্তর-প্রত্যুত্তর ঢঙের ছড়াগান। এ থেকে আবার আসে কবিগান, যা দুটি পক্ষের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। এরই চরম রূপ হচ্ছে খেড় বা খেউড়।

যুগ-পরবির্তন সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে জারি গান, সারি গান ইত্যাদি লোকগীতির ধারা সচল থাকে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাবে পাঁচালি-কীর্তন ঢঙ বদলে আখড়াই ও পরে হাফ-আখড়াইতে পরিণত হয়। এই বিস্রস্ত ধারার মধ্য দিয়েই চলে আসে যুগান্তর।

আধুনিক যুগ:

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম পর্ব নির্মাণ করেন পাদ্রি আর সংস্কৃত পন্ডিতরা। তাঁদের গদ্যরচনার মধ্য দিয়ে প্রারম্ভিক স্তরটি নির্মিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে আগমন ঘটে চিন্তাশীল ও সৃষ্টিশীল বাঙালি সাহিত্যিকদের। তৃতীয় পর্বের ব্যাপ্তি কম হলেও এর রচনাসম্ভার উৎকৃষ্ট ও প্রাচুর্যময় এবং গোটা সময়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। চতুর্থ পর্বের শুরু রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই, যার স্থায়িত্ব ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগ পর্যন্ত; একে তিরিশোত্তর বা রবীন্দ্রোত্তর পর্বও বলা হয়। এরপর রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে সাহিত্যিক ভাবধারারও পরিবর্তন ঘটে; ফলে বাংলা সাহিত্য পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত কলকাতা এবং সদ্যোজাত পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ভিত্তিক দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। তাই সবশেষে যে পর্বের সূচনা হয় তাকে এক কথায় বাংলাদেশ পর্ব (১৯৪৭-) বলা চলে।

প্রস্তুতিপর্ব সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা সাধারণত সুনির্দিষ্ট কোনো সন-তারিখ মেনে হয় না, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধরা হয়। এ যুগ নানা দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, সমৃদ্ধি ও বেগবান হওয়ার যুগ; বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সুবিখ্যাত ও সমাদৃত হওয়ার যুগ।

প্রাচীন ও মধ্য যুগীয় বাংলা সাহিত্য শুধু পদ্যেই রচিত হতো। তখন সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল সীমাবদ্ধ এবং তাতে বাঙালি জীবনের প্রতিফলন ঘটত কম। প্রাচীন কবিদের জীবনী সম্পর্কেও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব ছিল। সাহিত্যচর্চা হতো প্রধানত রাজপৃষ্ঠপোষকতায়। আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মূল লক্ষণগুলি হলো অনুকরণপ্রিয়তা, বৈচিত্র্যহীনতা, ধর্মমত প্রচারের প্রবণতা (প্রণয়কাব্য ও লোকগাথা ব্যতিক্রম) এবং হৃদয়াবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্য।

উনিশ শতক হচ্ছে বাঙালির নবজাগরণের যুগ। এ সময় বাঙালি-প্রতিভার সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটে এবং জাতি হিসেবে বাঙালির অভ্যুদয়ের সর্ববিধ প্রচেষ্টারও সূত্রপাত ঘটে। এ যুগেই একটি শক্তিশালী সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়। এ সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান কয়েকটি বিশেষত্ব হচ্ছে:

ক. শক্তিশালী গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি ও তার অসাধারণ বিকাশ;

খ. উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের গদ্য-সাহিত্যে সংস্কৃত পন্ডিতদের প্রভাব;

গ. বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বের আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের নিবিড় সংযোগ;

ঘ. জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি;

ঙ. সাময়িক সাহিত্য সৃষ্টি;

চ. মান-বাংলা হিসেবে চলিত ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ ও পরবর্তী ধারায় এর ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব;

ছ. কাব্য-সাহিত্যের অসামান্য উন্নতি;

জ. সর্বদেশীয়, সর্বকালীয় ও সর্বজাতীয় সার্বভৌম সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ এবং

ঝ. জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হওয়া এবং সাহিত্যই যে জাতীয় চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানদন্ড এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

উপর্যুক্ত সংঘটনগুলির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, ১৭৫৭ সালে বঙ্গদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা ইংরেজদের হস্তগত হলেও সাংস্কৃতিক জীবনে উনিশ শতকের পূর্বে ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য প্রভাব অনুভূত হয়নি। প্রধানত ইংরেজদের শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটার মধ্য দিয়েই আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইউরোপীয় সংস্কৃতির নিকটবর্তী হয়। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন ঘটে, তাকে ঐতিহাসিকগণ 'নবজাগৃতি' বা 'রেনেসাঁ' নামে আখ্যায়িত করেন। এর ফলস্বরূপ উনিশ শতকের সাহিত্যে মানব-প্রাধান্য, গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব, সাময়িক পত্রের আবির্ভাব ইত্যাদি বৈচিত্র্যের সূত্রপাত হয়। এ সময় উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের গদ্য-সাহিত্য এবং ইংরেজির আদর্শে নাটক ও কাব্যসাহিত্য (মহাকাব্য-আখ্যায়িকা, সনেট, গীতিকবিতা) রচিত হতে থাকে; এমনকি ইউরোপীয় ধাঁচে নতুন নতুন রঙ্গমঞ্চও নির্মিত হতে থাকে।

উপসংহার:

নানা চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক রূপ ধারণ করেছে। ইয়ং বেঙ্গল প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেন ইয়ং বেঙ্গল সদস্যরা। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তাঁরা ছিলেন প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কারের বিরোধী। তাঁরা নির্বিচারে কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম তখনকার (১৮৩১-১৮৫৭) বাঙালি সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম এ ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে রচিত তাঁর আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস। ভাষাগত কারণেও উপন্যাসটি সমকালে এবং পরবর্তীকালে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে। তাঁর অন্যান্য রচনায়ও ভাষা ব্যবহারের এই স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান, যে কারণে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে 'আলালি গদ্য' নামে তাঁর ভাষাকে পৃথক মর্যাদা দেওয়া হয়।

প্যারীচাঁদের অনুসরণে বাংলা ভাষাকে আরও গণমুখী করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)। তাঁর হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২) উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষারীতি প্যারীচাঁদের ভাষার চেয়ে মার্জিততর। আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রধান রূপকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নানাভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন উনিশ শতকের মানবতাবাদে যেমন, বাংলা গদ্যের সার্থক শিল্পরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। রামমোহন বাংলা গদ্যের কাঠামো তৈরি করেন, আর বিদ্যাসাগর তাতে প্রাণসঞ্চার ও সৌন্দর্য সংযোজন করেন। তিনি বাংলা সাধুগদ্যের একটা আদর্শ রূপ দেন, যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালের লেখকগণ অনুপম সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

প্রবন্ধের সুসংবদ্ধ বক্তব্যের জন্য উপযুক্ত গদ্য রচনা করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। তাঁর রচনার বিষয় সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি; আর এ কারণেই রচনার শিথিল ভঙ্গি তাতে গ্রাহ্য হয়নি। এ সময়ের অন্যতম প্রধান পন্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) অধিকাংশ রচনা ইংরেজিতে হলেও বাংলায় তিনি খ্যাত মাসিক পত্রিকা বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১), রহস্যসন্দর্ভ (১৮৫১) ও বিবিধার্থ সংগ্রহসন্দর্ভ-এর (১৮৬৩) জন্য। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮) এবং আত্মচরিত-এ (১৯০১) পাওয়া যায় মননশীলতার গভীর পরিচয়। রামগতি ন্যায়রতœ (১৮৩১-১৮৯৪) বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭২, ১৮৭৩) রচনা করেন। পাঠ্যপুস্তকের লেখক মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) বিদ্যাসাগর পর্বের একজন উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১. বাংলা সাহিত্যের কথা- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য- দীনেশচন্দ্র সেন

৩. বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য- প্রবোধচন্দ্র বাগচী

৪. প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের কালক্রম- সুখময় মুখোপাধ্যায়

৫. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. কতো নদী সরোবর- হুমায়ুন আজাদ

৭. সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা- আহমদ শরীফ

৮. লাল নীল দীপাবলি- হুমায়ুন আজাদ

৯. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা- সৌমিত্র শেখর

১০. ভাষার ইতিবৃত্ত- সুকুমার সেন